কবিতা কী ও কেন (১৯৮২)

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতা কী

ধরা যাক, আমরা শিকার করতে বেরিয়েছি। ধরা যাক, আমরা একটি সিংহ শিকার করব। কিন্তু যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সিংহ সেখানে সত্যি-সত্যি আছে তো? কীভাবে বুঝব যে, সে আছে? ধরা যাক, একটু আগেই আমরা তার গর্জন শুনেছি। কিংবা নরম মাটিতে দেখেছি তার পায়ের ছাপ। সেই শোনা কিংবা সেই দেখার উপরে নির্ভর করে আমরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। দূরের একটা ঝোপ যেন একটু নড়ে উঠল। সিংহ? চকিতে একটা ছায়া যেন আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে গেল। সিংহ? আমাদের প্রত্যেকেরই স্নায়ু একেবারে টানটান হয়ে আছে। হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে মুখের মধ্যে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বুকের ধকধক খুব স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি যে, আর দেরি নেই, এইবারে হয়তো যে-কোনও মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ধরা যাক, ঠিক এইভাবেই একটি কবিতার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা। আমরা শুনেছি যে, কবিতা কিছু অসম্ভব শশবিষাণের ব্যাপার নয়, কবিতা

বলে সত্যিই কিছু আছে, এবং আমাদের ধারে কাছেই আছে। তাই আমরা আশা করছি যে, আমাদের অন্বেষণ বিফলে যাবে না, যে-কোনও মুহূর্তে আমরা তার দেখা পাব।

কিন্তু দেখা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, দেখা যখন হবে, তখন তাকে চিনে নিতে পারব তো? প্রশ্নটা আমাদের নয়, বিদেশি এক কবি-সমালোচকের। কিন্তু আর্চিবলড ম্যাকলিশ যখন এই প্রশ্ন তোলেন, তখন তার সমস্যাটা যে কী, তা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি। আসলে, সিংহ কিংবা বাঘ কিংবা টেবিল কিংবা চেয়ার কিংবা কলম কিংবা বই কিংবা এই রকমের আরও অজস্র প্রাণী অথবা বস্তুকে যত সহজে চিনে নেওয়া যায়, কবিতাকে চিনে নেওয়া তত সহজ ব্যাপার নয়।

কেন নয়? ম্যাকলিশ এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ইতিপূর্বে আমরা যদি সিংহ না-ও দেখে থাকি, তবু যে তাকে দেখবামাত্র আমরা চিনে নিতে পারি, তার কারণ আর কিছু নয়, নানা জনের কাছে এই প্রাণীটির যে-বর্ণনা আমরা শুনেছি, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। গল্পের অন্ধেরা যখন হাতির বর্ণনা দিয়েছিল, তখন তাদের একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে সাপের মতো; একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে কুলোর মতো; একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে থামের মতো; আর যে অন্ধটি হাতির শূড়, কান বা পা ছোঁয়নি, শুধু— হাতি যখন তার পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন- আন্দোলিত বাতাসের একটা ঝাপটা খেয়েছিল মাত্র, সে বলেছিল যে, হাতি হচ্ছে একটা ঝড়ের মতো ব্যাপার। কিন্তু তেমন কোনও বিভ্রাট এক্ষেত্রে ঘটছে না। সিংহের বর্ণনা যাঁরা দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তাঁরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদের দেওয়া সেই বর্ণনার উপরে নির্ভর করেই সিংহকে শনাক্ত করা যায়। পক্ষান্তরে, কবিতা নামক ব্যাপারটাকে যে

তেমন করে আমরা শনাক্ত করতে পারি না, তার কারণ, তার বিষয়ে যেসব বুর্ণনা আমরা পেয়েছি, অনেকক্ষেত্রেই সেইসব বর্ণনার মধ্যে কোনও মিল নেই। এমনকি, প্রায়শ তারা পরস্পরের বিরোধী। রামের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে শ্যামের বর্ণনা মেলে না। যাদুর বর্ণনা ও মধুর বর্ণনার মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। নবীনের দেওয়া বর্ণনায় আবার রাম শ্যাম যদু ও মধু, প্রত্যেকেরই আপত্তি ঘটে। ফলে, তাকে শনাক্ত করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুই মহাজন যার বর্ণনায় একমত হতে পারেন না, কীভাবে তাকে আমরা খুঁজে ফিরব? এবং দেখা হয়ে গেলেই বা কীভাবে, কোন কোন লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নেব তাকে?

সর্বসম্মত কোনও বর্ণনা কিংবা সংজ্ঞা না-পাবার যে অসুবিধা, কবিতার আলোচক-মাত্রেই কখনও-না-কখনও তার সম্মুখীন হন। তখন কীভাবে তাকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেন তাঁরা? তাদের কেউ-বা কোনও পূর্বাচার্যের দেওয়া সংজ্ঞাকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে অতঃপর তারই আলোয় চিনবার চেষ্টা করেন যে, কোনটা কবিতা আর কোনটা নয়। কেউ-বা সে-ক্ষেত্রে, কোনও পূর্বাচার্যের সংজ্ঞাকে একেবারে পুরোপুরি হয়তো মেনে নেন না, কিন্তু তারই সূত্র ধরে চেষ্টা করেন। অন্য কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণের। আবার কেউ-বা, অন্য কারও সংজ্ঞার মুখাপেক্ষী না-হয়ে, একান্তভাবে অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে, অন্য পথে এগিয়ে যেতে চান। চেষ্টা করেন, পূর্বলব্ধ যাবতীয় সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কহীন, কোনও নূতন সংজ্ঞা খুঁজে নিতে। কিন্তু সেই নূতন সংজ্ঞা যখন খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা নিয়েও আবার নূতন করে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। কাকে কবিতা বলে, এই প্রারম্ভিক প্রশ্নেরই কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ ও লক্ষণ নির্ণয়ের এই যে নব-নব প্রয়াস, এবং তার থেকে সঞ্জাত এই যে বিরোধ, এই নিয়েই আমরা এখানে প্রশ্ন

তুলতে পারি। বলতে পারি যে, নূতন করে আবার এতসব বাদবিসংবাদের মধ্যে জড়িয়ে যাবার দরকার নেই, তার চেয়ে বরং প্রাচীন মতামতগুলির দিকেই আর-এক বার চোখ ফেরানো যাক। দেখা যাক, তা-ই দিয়েই আমাদের প্রয়োজন মেটে কি না। অর্থাৎ তারই উপরে নির্ভর করে আমরা বুঝে নিতে পারি কি না যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা আসলে কী।

মুশকিল। এই যে, কবিতা-সংক্রান্ত আমাদের এই জিজ্ঞাসা সেখানেও কোনও চূড়ান্ত উত্তর খুঁজে পায় না। বিসংবাদের ক্ষেত্রটি বস্তুত সেখানেও বেশ বড়ো মাপের। বামনাচার্য যখন বলেন, কাব্যং গ্রাহ্যামলংকারাৎ, তখন প্রতিবাদীরা বলেন, তা কেন হবে, অলংকৃত বাক্যমাত্রেই কিছু কাব্যের মর্যাদা পেতে পারে না; উপরন্তু, বাক্যবন্ধ নিরলংকার হলেই তা যে কাব্য বলে গ্রাহ্য হবে না, এমনও নয়। বস্তুত, কাকে আমরা অলংকার বলব, এবং কাকে নয়, বিরোধ ঘটে তা নিয়েও। বিশ্বনাথ অবশ্য অলংকৃত বাক্যবন্ধের উপরে জোর দেন না, গুরুত্ব আরোপ করেন। রসের উপরে। কিন্তু, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম, এই সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাটিও যে আমাদের চূড়ান্ত সন্তোষ উৎপাদন করে না, তার কারণ, সেক্ষেত্রে আমরা আবার নূতন জিজ্ঞাসার জালে জড়িয়ে যাই। কাব্যজিজ্ঞাসাকে মুলতুবি রেখে তখন আবার সন্ধান করতে হয়। যে, রস কাকে বলে।

আনন্দবর্ধন সম্পর্কে, আরও অনেক কথার মতো, এই কথাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যের ব্যাপারটাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি একেবারেই বিপরীত বিন্দু থেকে অগ্রসর হয়েছেন। কাব্য কী, তা জানাবার জন্যই তিনি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কাকে আমরা কাব্য বলতে পারি না। আমরা যাকে ‘এলিমিনেশন পদ্ধতি’ বলি, বস্তুত তারই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি; এবং

বলছেন যে, যে-বাক্যবদ্ধ থেকে নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই আমাদের লভ্য নয়, কাব্য বলে গণ্য হবার কোনও যোগ্যতাই তার নেই।

ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াল? মোটামুটি এই দাঁড়াল যে, বাক্য যখন কাব্য বলে গণ্য হতে চায়, তখন তার মধ্যে নিতান্ত শব্দার্থের অতিরিক্ত কোনও অর্থের কিংবা তাৎপর্যের আভাস থাকা চাই। এই যে তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত অর্থ, এরই প্রসঙ্গে আসবে ব্যঞ্জনার কথা। কিন্তু তার আগে একবার পাশ্চাত্যের কাব্যতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া যাক, এবং দেখা যাক যে, কাব্যবিচারের কোনও সহজ সূত্র সেখানে মেলে কি না।

আরিস্টটলের কথাই ধরা যাক। কাব্য-বিষয়ে তার অতিবিখ্যাত যে-প্রস্তাবের কথা সবাই জানেন, এবং গিলবার্ট মারের সিদ্ধান্ত(১) মেনে নিলে যে-প্রস্তাবকে আমরা কবিতা নামক ব্যাপারটার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করতে পারি, সেখানে কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক জিজ্ঞাসার কোনও জবাব মেলে না। কবিতাকে সেখানে হরেক শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন আরিস্টটল, এবং বর্ণনা করেছেন তাদের ইতিহাস ও লক্ষণাবলি, কিন্তু কবিতা বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে তা তিনি নির্দেশ করেননি।

কবিতার জন্মরহস্য সম্পর্কে অবশ্য তিনি নীরব নন। রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় আছে "পুরাকালে সরস্বতী পুত্র কামনা করিয়া হিমালয়পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সন্তুষ্ট মনে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন– "আমি তোমার পুত্র সৃষ্টি করিতেছি।' তাহার পর সরস্বতী কাব্যপুরুষকে প্রসব করিলেন।"(২) আরিস্টটল কিন্তু তেমন কোনও দৈব উৎসের উল্লেখ করেন না। বরং বেশ স্পষ্ট করেই তিনি আমাদের জানিয়ে দেন যে, কবিতা আসলে বাস্তব জীবন কিংবা ঘটনারই এক ধরনের অনুকৃতিমাত্র। তাঁর বক্তব্য, "মানুষ হচ্ছে অনুকরণপ্রিয় প্রাণী, সে সবকিছুকে অনুকরণ করে দেখাতে পারে, যা কিনা

অন্যান্য প্রাণী পারে না," এবং তার এই অনুকরণস্পাহা থেকেই জন্ম নিয়েছে কবিতা।

বলা বাহুল্য, অ্যারিস্টটলের এই উকি আমাদের ভাবায়, কিন্তু আমাদের কৌতূহল শুধু এইটুকু জেনে তৃপ্ত হয় না। তার কারণ, গ্রিক দার্শনিকের ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটবার দরুন ইতিমধ্যে আমরা এ-ও জেনেছি যে, শুধু কবিতা নয়, সর্বারকমের সুকুমার শিল্পই হচ্ছে বাস্তবের অনুকরণ। অর্থাৎ কোনও শিল্পকেই মৌল কোনও রচনা বলে গণ্য করা চলে না, সবই আসলে মূলের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, চিত্রকলার সঙ্গে কবিতার তবে আর পার্থক্য কোথায়, কিংবা কীসের উপরে ভিত্তি করে তা হলে ভাস্কর্য কিংবা সংগীত থেকে কবিতাকে আমরা আলাদা করে চিনে নেব?

আরিস্টটল যে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি, তা অবশ্য নয়; তিনি আমাদের বলেই দিচ্ছেন যে, সব শিল্পই যদিও বাস্তব অথবা সত্যের অনুকৃতিমাত্র, তবু বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যম, বিষয় ও রীতি বা পদ্ধতি তো এক নয়, সে-ক্ষেত্রে তারা পরস্পর থেকে পৃথক। বস্তৃত, মাধ্যম, বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা থেকেই বিভিন্ন শিল্পকে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি।

কোনও শিল্পকে পৃথকভাবে শনাক্ত করবার এই যে উপায়, এরই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে চিত্র ভাস্কর্য কিংবা সংগীতকলা থেকে কবিতাকে একেবারে আলাদা করে চিনে নেবার একটি সহজ সূত্র। চিত্রের মাধ্যম যদি রং ও রেখা, ভাস্কর্যের মাধ্যম যদি ত্রিমাত্রিক শিলাখণ্ড এবং সংগীতের মাধ্যম যদি ধ্বনি, কবিতার মাধ্যম তাহলে শব্দ। কবিতা কী, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তবে আর চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলবার দরকার কী? খুব সহজেই তো এখন তা হলে আমরা বলতে পারি যে, কবিতা হচ্ছে শব্দ। মুশকিল। এই যে, কেউ-কেউ শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হন না, আরও খানিকটা এগিয়ে যান। তাদের বক্তব্য,

শব্দকে এক্ষেত্রে শুধু মাধ্যম” বলাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে আরও বড়ো। যার ভিতর দিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ পাচ্ছে, সেই শব্দগুলিকে যদি আমরা সরিয়ে নিই, কবিতাটিরও কোনও অস্তিত্ব তাহলে থাকে না। সেই বিচারে আমাদের বলতে হয় যে, কবিতা হচ্ছে শব্দ, এবং শব্দই হচ্ছে কবিতা।

তা কি আমরা বলতে পারি? না, পারি না। কেন পারি না, একটু বাদেই সে-কথায় আবার আসা যাবে। তার আগে বলা দরকার যে, কাব্যজিজ্ঞাসার এই সহজ সমাধানকেও অনেকে একেবারে অগ্রাহ্য করছেন না। এবং তাঁদেরই মধ্যে একজন, চার্লস হুইলার, আমাদের জানাচ্ছেন যে, যে-সমাধান সবচেয়ে সরল, স্রেফ ওই সারল্যের জন্যেই অনেকক্ষেত্রে সেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।(৩) প্রসঙ্গত তিনি এডগার অ্যালান পো’-র সেই গল্পের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যে একখানা চোরাই চিঠিকে আসামি যেখানে পুলিশের একেবারে চোখের সামনেই ফেলে রেখেছিল। বলা বাহুল্য, চোখের সামনে ছিল বলেই পুলিশ সেটা দেখতে পায়নি, কিংবা দেখতে পেলেও গুরুত্ব দেয়নি, হরেক গোপন জায়গায় তারা সেই চিঠির জন্য গলদঘর্ম তল্লাশ চালিয়েছে। শুধু পো’-র ওই একটি গল্প কেন, এমন আরও অনেক রহস্যকাহিনি আমরা পড়েছি, লেখক যেখানে পাঠকের সামনে একটি সহজ সমাধান বুলিয়ে রেখে দেন, অথচ সহজ বলেই পাঠক সেটাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, তার নজর স্বতই চলে যায় সম্ভাব্য আরও হরেক সমাধানের দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বোকা বনতে হয়, কেন-না শেষ পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়ে দেন যে, ওই সহজ সমাধানটিই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। কিন্তু সে-কথা থাক। দরকারি কথাটা হচ্ছে এই যে, কবিতা-বিষয়ক এই সহজ সমাধানটিকে তুইলারও আসলে তার আলোচনাকে এগিয়ে নেবার সুবিধার জন্য গ্রাহ্য করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনিও একে চূড়ান্ত সমাধান বলে মানেননি।

মানছি না, বলা বাহুল্য, আমরাও। কেন-না, আমাদের চিত্তে ইতিমধ্যে অন্য-একটি জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে। কবিতা অবশ্যই শব্দ। কিন্তু নিতান্ত সেই কারণেই কি শব্দকে আমরা কবিতা বলে গ্রাহ্য করব? যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত শব্দকে? তাহলে তো যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত রং ও রেখাকে চিত্র বলে, যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক শিলাখণ্ডকে ভাস্কর্য বলে এবং যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত ধ্বনিকে সংগীত বলে আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু তা তো আমরা করি না। শুধু তা-ই নয়, ইতিমধ্যে আবার আর-এক দিক থেকেও এই সমস্যাটিকে আমরা দেখতে শুরু করেছি। আমরা ভাবছি যে, শুধু কবিতা কেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার— উপন্যাসের, গল্পের কি নাটকের-মাধ্যমও তো শব্দই। শুধু মাধ্যম নয়, তার চেয়ে বেশি-কিছু। কেন-না, সে-ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যার মাধ্যমে সেগুলি রচিত হচ্ছে, সেই শব্দগুলিকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, উপন্যাস, গল্প কী নাটকেরও কোনও পৃথক অস্তিত্ব তাহলে থাকে না। সুতরাং শব্দ আর কবিতাকে যদি আমরা তুল্যমূল্য বলে মনে করি, তবে শব্দ আর উপন্যাস, শব্দ আর গল্প, কিংবা শব্দ আর নাটককেও তুল্যমূল্য জ্ঞান করতে হয়। এবং তা যদি আমরা করি, অবস্থাটা তা হলে এইরকম দাঁড়ায় :

কবিতা হয় শব্দ
শব্দ হয় উপন্যাস,
(সুতরাং) কবিতা হয় উপন্যাস।

অর্থাৎ, ব্যাপারটা একেবারে যৎপরোনাস্তি হাস্যকর হয়ে ওঠে।

তাহলে আমরা কী বুঝব? আমরা কি এটাই বুঝব যে, এক্ষেত্রে যে প্রেমিস অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য বা হেতুবাক্যের সোপান বেয়ে আমরা সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছিলুম, তারই মধ্যে একটা ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল, এবং সেই ভ্রান্ত

আশ্রয়বাক্যই একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়েছে? বলা বাহুল্য, তা-ই আমাদের বুঝতে হবে! আমাদের ধরেই নিতে হবে যে, শব্দ যদিও কবিতার মাধ্যম, এমনকি কবিতার অস্তিত্ব যদিও শব্দের অস্তিত্বের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল, তবু কবিতা ও শব্দকে তুল্যমূল্য কিংবা সমার্থক বলে গণ্য করা চলে না!

কোনও কলেরই কোনও কবি কিংবা সমালোচক যে তা করেছেন, তা-ও নয়। কবিতার আলোচনায় এই অভিমত। তবে প্রাধান্য পেয়েছিল। কেন যে, পোয়ট্রিইজ ওয়ার্ডস? প্রাধান্য যাঁরা দিয়েছিলেন, কবিতাকে যে র্তারা মুখ্যত একটি ভাষাশিল্প বলে গণ্য করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, নিতান্ত ভাষাশিল্প না-ভেবে, কবিতাকে যাঁরা বিশেষ এক ধরনের ভাষার শিল্প বলে মনে করতেন, প্রতিপত্তি তাদেরও কিছু কম ছিল না। তাঁরা এমনও ভাবতেন যে, কবিতা হচ্ছে এমনই সুকুমার একটি শিল্প, যা তার উপাদান হিসেবে শুধু সুকুমার শব্দই দাবি করে। সমস্ত শব্দই যে কবিতায় ব্যবহৃত হবার যোগ্য, এবং যোগ্যজনের হাতে পড়লে, কোনও শব্দকেই যে কবিতার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশকারীর মতো অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, এই উদার ধারণা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। ‘পোয়েটিক ডিকশন” বলে যে-ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত, তার প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের অত্যধিক আসক্তির কথা আমরা শুনেছি। সেইসঙ্গে জেনেছি যে, শেকসপিয়রের রচিত একটি সংলাপ কেন পরবর্তীকালের একজন বিখ্যাত সমালোচকের অনুমোদনলাভে ব্যর্থ হয়েছিল। ম্যাকবেথের উক্তির মধ্যে নাইফ’ শব্দটা ড. স্যামুয়েল জনসনের পছন্দ হয়নি; বস্তুত তার এমনও মনে হয়েছিল যে, ওই শব্দটা থাকার ফলে গোটা সংলাপটাই একেবারে ঝুলে গেছে। মনে হবার কারণ আর কিছুই নয়, “নাইফ’ নামক অস্ত্রটি কসাই ও পাচকেরা ব্যবহার করে থাকে, এবং- ড.

জনসনের বিবেচনায়- এই 'ইতরজনসংসর্গের ফলে তার শুচিতা নষ্ট হয়েছে, সুতরাং কবিতায় তার উল্লেখ নিষেধ। শেকসপিয়রের কপাল ভালো, ড. জনসনের পাল্লায় তাকে পড়তে হয়নি, স্বদেশীয় সাহিত্যের শব্দারুচি অত্যধিক সভ্যভব্য হয়ে উঠবার অনেক আগেই তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

কাব্যিক শব্দের প্রতি এই যে পক্ষপাত, এটা কিন্তু একান্তভাবেই অষ্টাদশ শতকের ব্যাপার নয়, কিংবা বিশেষভাবে ইংরেজি সাহিত্যেরও ব্যাপার নয়। এই সেদিনও বাংলা কাব্যসাহিত্যের যা ছিল প্রধান স্রোতোধারা, এবং মুখ্যত যা ছিল রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে উৎসারিত, গত শতাব্দীর অন্ত্য অধ্যায় ও এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে তার মধ্যেও এই একই পক্ষপাত আমরা দেখতে পাই। আমরা লক্ষ করি যে, সাধারণ মানুষেরা তাদের কথাবার্তায় যেসব শব্দ প্রায়শ ব্যবহার করে থাকে, সেই আটপৌরে শব্দগুলি সেখানে বিশেষ প্রশ্রয় পায় না, এবং সাধারণ মানুষদের নিত্যব্যবহার্য নানা সাংসারিক জিনিসপত্র সম্পর্কেও সেই কবিতা বড়ো বিস্ময়করভাবে নীরব থাকে।

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি টমাস গ্রে বলেছিলেন, কবিতা কখনও তার সমকালীন ভাষায় রচিত হয় না। গ্রে-র এই উক্তিকেই বাংলা কবিতা পরবর্তী শতকে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল কি না, তা আমার জানা নেই। তবে, উনিশ শতকের অন্ত্য অধ্যায় থেকে তঁর মৃত্যুকাল অবধি যিনি ছিলেন বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ, সেই রবীন্দ্রনাথের, অন্যবিধ সাহিত্যকর্মে না হোক, কবিতায়— এমনকি, এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে রচিত কবিতায়- যে-শব্দারুচির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাতে আমরা বুঝতে পারি যে, কবি হিসেবে তিনিও ছিলেন "কাব্যিক" শব্দের পক্ষপাতী। তাঁর

সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলিতেও এই সত্যটা গোপন থাকেনি। সেখানে তিনি দাবি করছেন বটে, "আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই,"(৪) কিন্তু পরীক্ষণেই বলছেন, "বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন বলে সামলে নিতে হয়।"(৫) শুনে কি গ্রে-র কথাটাই মনে পড়ে। না? আবার যখন শুনি, "বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়োফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে,"(৬) তখন সেই জনসনের কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, কসাই ও পাচকের সংসর্গদোষ নাইফ শব্দটার জাত মেরে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে সেই পর্যায়ে রচিত তার কবিতায় কোথাও আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেননি, কিংবা নামোল্লেখ করেননি। আমাদের নিত্যব্যবহার্য বস্তুসামগ্রীর, তা অবশ্য নয়। এক্ষুনি আমার মনে পড়ছে গত শতকের অন্ত্য দশকে রচিত তার একটি বিখ্যাত কবিতার(৭) কথা, যেখানে 'হাঁড়ি' 'সরা' থেকে শুরু করে 'গুড়ের পাটালি' আর 'ঝুনা নারিকেল' পর্যন্ত এমন-সমস্ত শব্দের উল্লেখ ঘটেছে, হেঁশেল আর উদরের সঙ্গে যাদের 'সংসর্গদোষের' কথা আমরা সবাই জানি। উপরন্তু সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে আটপৌরে বাগভঙ্গিমাও। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা লক্ষ না-করে পারি না যে, এই জাত-যাওয়া বস্তুসামগ্রীর নাম আর আটপৌরে বাগভঙ্গিমা আসছে কবিতাটির শুধু সেই অংশেই, যেখানে তিনি একটু রঙ্গরসের লঘু আবহ গড়ে তুলতে চান। আমরা বুঝতে পারি, আটপৌরে শব্দ আর আটপৌরে বাগভঙ্গিমা সেখানে তীর কৌতুকের উপকরণমাত্র। তার বেশি মর্যাদা তিনি তখনও তাদের দিচ্ছেন না। এমনকি তার অনেক বছর পরে লেখা, প্রায় একই রকমের বিখ্যাত, আর-একটি কবিতাতেও(৮) না। সেখানে বুগণা নারীটি যখন বলে, "রাধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাধা / বাইশ বছর এক চাকাতে বাধা", তখন সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে কত অনায়াসেই তো নিত্যব্যবহার্য নানা

তৈজসপত্রের উল্লেখ ঘটতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা ঘটতে দেন না, হেঁশেলের আভাসমোত্র দিয়েই তাকে- তারই ভাষায় বলি- "সামলে নিতে হয়।" অথচ ওসব জিনিসের উল্লেখ ঘটলে কবিতাটির বেদনার দিকটা যে কিছুমাত্র চাপা পড়ত, এমন কথা বিশ্বাস করবার কোনও যুক্তি নেই।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ইংরেজি সাহিত্যের হঠাৎ-ভাব্য-হয়ে-ওঠা পরিবেশের মধ্যে স্যামুয়েল জনসন যখন অকাব্যিক" শব্দের দিকে তঁর নিষেধের তর্জনী তুলে ধরছিলেন, টমাস গ্রে যখন সমকালীন ভাষা থেকে কবিতার ভাষাকে একেবারে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিচ্ছিলেন(৯) এবং অলিভার গোলডিস্মিথ যখন তার এই প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টায় ছিলেন যে, সব শব্দ নয়, প্রতিটি ভাষাতেই আসলে কবিতায় ব্যবহৃত হবার যোগ্য আলাদা এমন-কিছু শব্দ রয়েছে, যা আমাদের কল্পনাকে দীপিত করে ও কর্ণকে আরাম দেয়'(১০) তখন অন্যদিকে ধীরে-বীরে তৈরি হয়ে উঠছিল বিদ্রোহের পটভূমি। আমরা জানি যে, এর কিছুদিন বাদেই আবির্ভাব ঘটবে ওয়ার্ডসওয়র্থের। জানি যে, পোশাকি শব্দকে নির্বাসনে পাঠাবার আহবান জানাবেন তিনি। বলবেন যে, শুধু সেই ভাষাতেই কবিতা লেখা উচিত, যা কিনা মানুষের নিত্যব্যবহার্য মুখের ভাষা। (১১)

বলা বাহুল্য, ঝোকটা এক্ষেত্রে বিপরীত বিন্দুতে পড়ছে বটে, কিন্তু এ-ও আসলে চরম পন্থাই, এক ধরনের শব্দকে যা সমূহ গ্রহণ করতে বলে ও অন্য ধরনের শব্দকে যা সমূহ বর্জন করতে শেখায়। বুঝতে চায় না যে, কবিতার উপাদান হিসেবে সমস্ত শব্দই গ্রাহ্য, কিন্তু নির্বিচারে কোনও শব্দই গ্রাহ্য নয়। আসলে, কোনও কবিতার মধ্যে কোনও শব্দকে অনধিকার-প্রবেশকারী বলে মনে হবে কি না, সেটা একেবারে সর্বতোভাবেই নির্ভর করছে শব্দগুলিকে যিনি ব্যবহার করেন, তাঁর যোগ্যতার উপরে। বস্তুত, কোনও কবিতার মধ্যে

কোনও শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছ যখন আড়ষ্ট, অপ্রতিভা ও অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং কবিতাটিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করে না, তখন এটাই আমাদের বুঝতে হবে যে, শব্দ-নির্বাচনে- অন্তত সেই কবিতাটিকে নির্মাণ করে তুলবার সময়ে- তিনি যথেষ্ট রকমের যোগ্যতা দেখাতে পারেননি।

আটপৌরে-শব্দ-সংবলিত কথ্যভাষায় কবিতা লিখবেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই প্রতিজ্ঞায় তাঁর সমসাময়িক অন্য-এক বিশিষ্ট কবির, কোলরিজের কিছুমাত্র সায় ছিল না। তার কারণ, 'কাব্যিক শব্দসুষমার প্রতি তাঁরও আসস্থা ছিল আত্যন্তিক। আপন প্রত্যয়ের সপক্ষে সেদিন অতিশয় জোরালো রকমের তর্কও তিনি চালিয়েছেন। পরবর্তীকালের সাহিত্য-আলোচনার উপরে সেই তর্কবিতর্কের ছায়া যখন বারে বারে সঞ্চারিত হচ্ছিল, তখন, তারই মধ্যে, স্যার ওয়ালটার রলির মুখে আমরা এমন একটা কথা শুনতে পেলুম, যা কিনা একটা মীমাংসা-সূত্রের আভাস এনে দেয়। কবিতার আলোচনায় শব্দের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা তিনি অস্বীকার করলেন না, কিন্তু একই সঙ্গে বললেন যে, ওয়র্ড-অর্ডার বা শব্দ-বিন্যাসের গুরুত্বও কিছু কম নয়।(১২)

সম্ভবত আরও বেশি। রলি অবশ্য তার স্বদেশীয় কবিতার শব্দ-বিন্যাসের কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু শুধু ইংরেজি কবিতা নয়, সমস্ত ভাষার কবিতা সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। শব্দের সুষ্ঠু বিন্যাস আসলে কবিতামাত্রকেই সেই সামর্থ্য জোগায়, যা থাকলে তবেই একটি কবিতা, কিংবা তার একটি অংশ, সবচেয়ে জোরালোভাবে আমাদের চিত্তে এসে আঘাত করে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ছন্দের দিক থেকে যে-পঙক্তিটিকে বিচার করে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,(১৩) এবং বলেছিলেন যে, "ছন্দের ঝংকারের মধ্যে" দুলিয়ে দেবার ফলেই এই পঙক্তিটি এমন একটা স্পন্দন পেয়ে যাচ্ছে, যা "কোনো দিনই শান্ত হবে না", সেই "কেবা শুনাইল শ্যামনাম"কে

ক) শুনাইল কেবা শ্যামনাম

খ) শ্যামনাম কেবা শুনাইল

গ) কেবা শ্যামনাম শুনাইল

ঘ) শ্যামনাম শুনাইল কেবা

ঙ) শুনাইল শ্যামনাম কেবা।

বলা বাহুল্য, মূল পঙক্তিটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে এভাবে সাজিয়ে নিলেও তার অর্থ একই থাকে, এবং ছন্দের যেটা মূল কাঠামো, তারও কোনও হানি হয় না। কিন্তু নবতর এই বিন্যাসগুলি ঠিক ততটাই জোর পায় না, পঙক্তিটির মূল বিন্যাসের মধ্যে যতটা জোর আমরা লক্ষ করি। মূল বিন্যাসকে সেদিক থেকে 'ধ্রুব বিন্যাস' বলতে হয়। ধ্রুব এই অর্থে যে, তার আর কোনও নড়াচড়া হবার উপায় নেই।

একটু বাদেই এই বিন্যাসের প্রসঙ্গে আমাদের ফিরতে হবে। কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেটা এই যে, শব্দকে প্রাধান্য দেবার এই যে প্রবণতা, এরই সমান্তরালভাবে আর-একটি প্রবণতাও যে ভিন্নতর একটি সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছে, তা-ও আমরা লক্ষ না করে পারি না। আমরা দেখতে পাই যে, একদিকে যখন শব্দ ও ভাষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তখন, অন্যদিকে, ভাষার উপরে আসন দেওয়া হচ্ছে ভাবনাকে। শেলির "এ ডিফেনস অব পোয়ট্রি খুব স্পষ্ট করেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, কবিতার যা কিনা। সারাৎসার, ভাষার মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেন-না শব্দকে তা অতিক্রম করে যায়। শৃঙ্খলা (অর্ডার), সৌন্দর্য

(বিউটি) ও সত্যের (টুথ) সঙ্গে তার তুলনা টেনেছেন শেলি। বলছেন, শব্দ দিয়ে যা আমরা বানিয়ে তুলি, শুধু সেইটুকুর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়।

শেলির এই বক্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কবিতার শরীর ও কাব্য-ভাবনাকে শেলি আসলে পৃথক করে দেখতে চাইছেন। নিতান্ত শব্দের মধ্যে যেটুকু ধরা পড়েছে, আমরা যখন তারই উপরে নিবন্ধ করছি আমাদের আগ্রহ, তখন তার দিক থেকে আমাদের চিন্তাকে তিনি ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন সেই ভাবনার দিকে, ঠান্ডা ও কঠিন গুটিকয় শব্দের মধ্যে যার অনেকটা অংশই ধরা পড়েনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, কবির ভাবনার যে-অংশকে তিনি তার কবিতার মধ্যে ধরিয়ে দিতে পারেননি, আমাদেরই কি তা ধর্তব্য? সত্যি বলতে কী, তা-ও যদি আমাদের ধর্তব্য হয়, কবিতা নিয়ে তাহলে আর বিতণ্ডার অন্ত থাকে না। প্রেম ভালোবাসা বিদ্বেষ বিরহ যুদ্ধ রক্তপাত কিংবা এই রকমের যে-কোনও বিষয় নিয়ে নিতান্ত দায়সারা গোছের গুটি চার-ছয় লাইন লিখেও তো যে-কোনও কবি সে-ক্ষেত্রে অক্লেশে আমাদের বলতে পারেন যে, ওই চার-ছয় লাইনের মধ্যে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে যেন কবিতাটিকে আমরা বিচার করতে না যাই, কেন-না, ওর মধ্যে যেটুকু ধরা পড়েছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো করে, অনেক নিবিড় করে ওই বিষয়টিকে তিনি ভেবেছিলেন। বলা বাহুল্য, শিল্পীমাত্রেই তা-ই ভেবে থাকেন, এবং কোনও শিল্পীই তাঁর ভাবনাকে একেবারে সর্বাংশে তীর সৃষ্টির মধ্যে বিম্বিত করে দেখাতে পারেন না। কবি পারেন না, চিত্রকর পারেন না, ভাস্কর পারেন না। ভাবনা ও রূপের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য সর্বক্ষেত্রে থেকেই যায়। শুধু কবি বলে কথা নেই, তৃপ্তিহীনতা তাই শিল্পীমাত্রেরই নিয়তি।

অন্যান্য শিল্পের কথা থাক। কবিতার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কবির ভাবনার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হবার কোনও উপায় যদি আমাদের থাকত, তাহলে তো— সম্বলভাবে দেখতে গেলে— কবিতা পড়বার কোনও দরকারই আমাদের হত না। কিন্তু তেমন কোনও উপায় আমাদের নেই। ফলে, তার ভাবনার যেটা ব্যক্তি অথবা বাস্তব রূপ, শব্দ-রূপ, তারই সাহায্য নিতে হয় আমাদের। এবং খুশি থাকতে হয় কবির ভাবনার শুধু সেইটুকুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, যেটুকু তীর কবিতার মধ্যে বিম্বিত ও আভাসিত হয়েছে। কীভাবে বিম্বিত ও আভাসিত হয়েছে, শুধু সেইটুকুই আমাদের বিচার্য। যখন আমরা কবিতা পড়ি, তখন আমরা কবিতা-ই পড়ি; ভাবনার ওই শব্দ-রূপ ছাড়া আর কিছুই তখন আমাদের বিচার্য নয়।

কিন্তু ওই শব্দ-বৃপের ভিতর দিয়েই যে শব্দীতীতের আভাস পেয়ে যাই আমরা, তা-ই-বা কী করে অস্বীকার করি? বস্তৃত, গদ্যের সঙ্গে কবিতার এখানেই মস্ত পার্থক্য। গদ্যও এক ধরনের শব্দ-বুপাই, আমাদের ভাবনাকে সে-ও মূর্তি দেয়, কিন্তু শব্দ সেখানে তার তাৎক্ষণিক বা আভিধানিক অর্থের বেশি-কিছু আমাদের বলে না। কবিতার শব্দ সে-ক্ষেত্রে তার তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, ছাড়িয়ে প্রায়শ যায়ও, ইঙ্গিত করতে থাকে অন্যতর কোনও অর্থ কিংবা তাৎপর্যের দিকে।

এই যে তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া, একেই আমরা বলি ব্যঞ্জনা, আর এই ব্যঞ্জনকেই আমরা কাব্যের একটি ধ্রুব অভিজ্ঞান বলে গণ্য করতে পারি।

প্রশ্ন উঠবে, শব্দ কীভাবে তার তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যায়। উত্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তার একক শক্তিতে সেটা সম্ভব হয় না। প্রতিটি শব্দেরই একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, এবং, বাক্যের

ভিতর থেকে সরিয়ে এনে, শব্দগুলিকে যখন আমরা পৃথক-পৃথকভাবে দেখি, তখন সেই সুনির্দিষ্ট অর্থের আশ্রয়েই তাদের নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। পক্ষান্তরে, বাক্যের ভিতরে প্রবিষ্ট হবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে তাদের নিশ্চলতার অবসান ঘটে, তা-ও নয়। ঘটে একমাত্র তখনই, ঠিকমতো-নির্বাচিত দুই বা ততোধিক শব্দ যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ায়। এই যে পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়ানো, একে আমরা বিদ্যুন্ময়" সান্নিধ্য বলতে পারি। আমরা লক্ষ করি যে, এই সান্নিধ্য অর্জিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দের সেই অর্থগত নিশ্চলতার অবসান ঘটেছে, তারা চঞ্চল। হয়ে উঠেছে, এবং পরস্পরের সহযোগে তারা তাদের ধরাবাঁধা অর্থকে অতিক্রম করে অন্যতর কোনও অর্থ অথবা তাৎপর্যকে আভাসিত করতে চাইছে। অর্থাৎ, অর্থের বিচারে, যা ছিল নেহাতই একমাত্রিক বা 'ওয়ান-ডাইমেনশনাল' ব্যাপার, সহসা সে একটি বাড়তি মাত্রা পেয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা যখন পড়ি :

হে হংসবলাকা
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।...(১৪)

অথবা জীবনানন্দের কবিতায়

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়–
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে...(১৫)

তখনই আমরা শব্দের সেই বিদ্যুন্ময় সান্নিধ্যের ক্লিয়াফল উপলব্ধি করতে পারি। একটু আগে আমরা যে ওয়র্ড-অর্ডার বা শব্দ-বিন্যাসের কথা শুনেছিলুম, এইখানেই তার গুরুত্ব।

কিন্তু সঠিক বিন্যাস থেকে জাত এই যে ক্লিয়াফল,- ধরাবাঁধা অর্থের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এবং অন্যতর অর্থকে আভাসিত করার জন্য শব্দের এই যে চঞ্চলতা, শুধু কবিতার মধ্যেই যে একে আমরা দেখতে পাই, তা-ও নয়। দেখতে পাই অনেক গদ্যরচনার মধ্যেও। তখন আমরা বলি যে, সেই গদ্যরচনা-অন্তত সেই রচনার সেই অংশটুকু-যেন কবিতা হয়ে উঠেছে।

কবিতা কী, এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, কবিতা আসলে শব্দ নয়, বরং শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণাপনা। ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটি দ্যোতনা এনে দেয়। (উদ্ধৃত দুটি কবিতাংশে বাঁকা হরফে মুদ্রিত দুই বা ততোধিক শব্দ যেমন দিয়েছে।) অথবা বলতে পারি, কবিতা আসলে ভাষার একটি স্তর, কবিতা বলে গণ্য হতে হলে আমাদের ভাবনার শব্দ-রূপকে যে-স্তরে উত্তীর্ণ হতে হবেই; আবার, অন্যদিকে, গদ্যরচনাও যেস্তরকে মাঝে-মাঝে স্পর্শ করে যায়।

_____-

১. “it looks as if his Aristotle’s treatise on poetry was an answer to Plato’s challenge.” (আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বর ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদের ভূমিকা।)

২. রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৩. The Design of Poetry. Charles B. Wheeler.

৪. ৫. ৬. সাহিত্যধর্ম। সাহিত্যের পথে।

৭. যেতে নাহি দিব (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। সোনার তরণী।

৮. মুক্তি (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। পলাতকা।

৯. “The language of the age is never the language of poetry.” Thomas Gray.

১০. “There are certain words in every language particularly adapted to the poetical expression; some from the image or idea they convey to the imagination; and some from the effect they have upon the ear.” Oliver Goldsmith.

১১...”the real language of men.” W. Wordsworth.

১২. Wordsworth. Sir Walter Raleigh.

১৩. ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ।

১৪. বলাকা। বলাকা।

১৫. আট বছর আগের একদিন। মহাপৃথিবী।

কবিতা কেন

সত্যিই তো, কেন?

আমাদের চতুর্দিকে অহোরাত্র যে অসংখ্যা রকমের কর্মকাণ্ড চলেছে, এবং যার উপরে নির্ভর করছে আমাদের বৈষয়িক ভালোমন্দ, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে যদি কবিতা রচনা ও পাঠের ব্যাপারটাকে কার্যকরণের সূত্রে যুক্ত করে দেখানো যেত, এবং যদি বলা যেত যে, কিছু লোক কবিতা লেখেন ও কিছু লোক কবিতা পড়েন বলেই এত-সব কাজ অবাধে চলতে

পারছে, নইলে এসব কাজের চাকা কবেই অচল হয়ে পড়ত, তাহলে আর কথাই ছিল না, একেবারে নিশ্চিত হয়ে সে-ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারতুম যে, এই তো, এরই জন্যে কবিতা।

কিন্তু সেইসব কর্মকাণ্ডের কোনওটার সঙ্গেই কবিতার ঠিক তেমন কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। রাতারাতি জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ধাপে-ধাপে লাফিয়ে উঠছে অভ্রংলিহ অট্টালিকা, বিশাল বনস্পতিকে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে বুলডোজার, কারখানার চিমনি গিয়ে মেঘের বালিশে মাথা রাখছে, নদীর গর্ভ থেকে উঠে আসছে মস্ত-মস্ত পিলার, তার উপরে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের সড়ক, চায়ের পেটি কিংবা আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে হাইওয়ে কাঁপিয়ে ট্রাক ছুটছে, জাহাজের উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে গম, তেল, যন্ত্রপাতি কিংবা নিউজপ্রিন্ট, মাটির তলায় পাতা হচ্ছে রেলের লাইন, রানওয়ে থেকে উধর্বশ্বাসে উধর্বকাশে উঠে যাচ্ছে এরোপ্লেন,—এই যে এত-সব বৃহৎ ঘটনা, এর প্রত্যেকটিকে নিয়েই কবিতা লেখা যায় বটে, কিন্তু কবিতাকে এর একটিরও হেতু হিসেবে নির্দেশ করা চলে না। অর্থাৎ, এক কথায়, এসব কাজের কোনওটার সঙ্গেই কবিতার কোনও কার্যকারণের সম্পর্ক নেই। এমনকি, নিতান্ত জীবিকার্জনের জন্য নূযনতম যেটুকু উদ্যোগ আমাদের না থাকলেই নয়, তার সঙ্গেও না। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে কেউ কখনও কবিতা লিখতে বসেনি।

জীবিকার্জনের উদ্যোগের সঙ্গে কবিতার এই যে সম্পর্কহীনতা, রবীন্দ্রবর্ণিত কবি-গৃহিণী একেবারে সরাসরি এর দিকে আঙুল তুলেছেন। ভদ্রমহিলার উক্তি খুবই স্পষ্ট। স্বামীর উদেশে তিনি যখন বলেন :

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব–
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম;

মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।(১)

তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে একমত হই। আমরা বুঝতে পারি যে, এই গঞ্জনা একটা মস্ত বড়ো অভিমান থেকে উঠে আসছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাটা তাই বলে মিথ্যে নয়।

প্লেটো অবশ্য অন্য দিক থেকে তার আক্রমণ চালিয়েছিলেন। রিপাবলিক'-এর দশম গ্রন্থে কবিতার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, ক) এমন-সমস্ত বস্তুকে সে অনুকরণ করে দেখায়, যারা নিজেরাই অনুকরণ বা প্রতিচ্ছবিমাত্র; উপরন্তু খ) আমাদের হীন ও দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে সে উসকে দেয়, এবং বশবর্তী হতে শেখায় এমন-সমস্ত আবেগ-বাসনার, যেগুলিকে দমন করা দরকার।(২)

এই ধরনের আপত্তি যে এ-দেশে কখনও ওঠেনি, তা-ও নয়। রাজশেখর তার কাব্যমীমাংসায় যেসব আপত্তির উল্লেখ করেছেন, তা হল এই যে, ক) কাব্যে মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা থাকে, খ) অসৎ বা গ্রাম্য বিষয়ে উপদেশ থাকে, এবং গ) অশ্লীল বিষয়ের বর্ণনা থাকে।(৩) (সুতরাং তার অধ্যয়ন বা আলোচনা অনুচিত) রাজশেখর অবশ্য এসব আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু সে-কথা আবার পরে আসবে। আপাতত প্লেটোর প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

কবিতাকে প্লেটো যে কেন ছায়ার অনুকৃতি' বা "অনুকরণের অনুকরণ" বলে গণ্য করেন, তা আমরা জানি। বস্তুত, শুধু কবিতা কেন, যাবতীয় শিল্পকর্মই তাঁর কাছে "অনুকরণের অনুকরণমাত্র, তার বেশি মর্যাদা তিনি তাদের দেন না। কেন দেন না, রিপাবলিক-এ নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। তার মোদ্দা কথাটা এই যে, জাগতিক যেসব বস্তু আমাদের

চতুর্দিকে আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই পিছনে রয়েছে সেই বস্তু সম্পর্কিত ধারণা, এবং সেই ধারণাই হচ্ছে মূল সত্তা, বস্তু যার অনুকরণমাত্র। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ছুতোর-মিস্ত্রি যে-টেবিল বানাচ্ছেন, সেই টেবিলও আসলে টেবিল-সংক্রান্ত ধারণা বা টেবিলের মূল সত্তার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলত, কোনও শিল্পী যখন সেই টেবিলটিকে একে দেখান, তখন সেটা অনুকরণের অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো বলছেন, বস্তুত মূল সত্তার স্রষ্টা হচ্ছেন ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর যদি স্বয়ং একটা টেবিল বানাতেন, তা হলে তাঁর বানানো সেই টেবিল একটি মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারত। কিন্তু, যেজন্যেই হোক, তা তিনি বানাননি। টেবিল বানিয়েছেন সূত্রধর, এবং শিল্পী সেই টেবিলের ছবি এঁকেছেন। শিল্পীর টেবিল অতএব টেবিলের মূল সত্তা থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্ব রয়েছে।(৪)

ঠিক ততটাই দূরে রয়েছে কবিতাও। যেমন শিল্পীর ছবি, তেমন হোমারের কাব্যও অনুকরণের অনুকরণ, অর্থাৎ মূল সত্তা থেকে অনেক দূরবর্তী ব্যাপার। প্লেটো অন্তত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। তার যুক্তি : কবিদের দৃষ্টি মূল সত্যের প্রতি নিবন্ধ নয়, তারা তার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবিটিকেই শুধু দেখেন। এমনকি, সেই প্রতিচ্ছবিটিরও নির্মাতা তারা নন। তাঁরা শুধু সেই প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি রচনা করেন। তারা না-যোদ্ধা, না-জনসেবী, না-চিকিৎসক, না-পণ্ডিত। হোমারের কাব্যে যেসব বৃহৎ কর্মের বর্ণনা আমরা পাই, তিনি নিজে তার নায়ক নন। রিপাবলিক-এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, হোমারের কালের এমন কোনও যুদ্ধের কথা কি কেউ জানে, যে-যুদ্ধের সাফল্য তাঁর নেতৃত্বে অথবা পরামর্শে অর্জিত হয়েছিল? মানুষের উপকার হয়, এমন কোনও বাস্তব কৌশলের কি তিনি উদ্ভাবক? কিংবা এমন কোনও শিক্ষাকেন্দ্র কি তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তাঁর উপদেশ শ্রবণের জন্য যেখানে সমবেত হত? এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই উত্তর হচ্ছে না"। অর্থাৎ,

অন্যে পরে কী কথা, হোমারের মতো মহাকবিও নিজে কিছু ঘটান না, অথবা নিজে কিছু করেন না। অন্যের দ্বারা আয়োজিত ঘটনার অথবা অন্যের কৃতকর্মের বর্ণনা দেন মাত্র।(৫)

তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা কবিতা পড়বা কেন? মূল সত্তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কেন আমাদের আগ্রহকে সংহত করব সেই রচনার উপরে যা আসলে ছায়ার ছায়ামাত্র? প্লেটো বলছেন, সত্যিই তা করা উচিত নয়। বলছেন, শুধু হোমার কেন, সত্য সম্পর্কে কোনও কবিরই কোনও যথার্থ জ্ঞান নেই। সুতরাং কবিতার উপরে আমাদের আগ্রহকে তো আমরা সংহত করবই না, বরং মানবজীবনে কাব্যের প্রভাব যে কত অনিষ্টকর, অন্যদেরও তা জানিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য, অন্যদের জানিয়ে দেবার ব্যাপারে প্লেটোর উদ্যোগে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তার চেতাবনি সত্ত্বেও যে কবিতা রচনা ও পাঠের আগ্রহ এতাবৎকাল অব্যাহত থেকেছে, তা আমরা জানি। জানি যে, প্লেটো তার কল্প রাজ্য থেকে কবিতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের কল্পনাকে দীপিত করবার ব্যাপারে তার ভূমিকার কোনও অবসান। তবু ঘটেনি, মানুষের চিত্তভূমিতে তার আসন চিরকাল অটুটই ছিল। উপরন্তু আমরা এ-ও জানি যে, কবিতার প্রতি প্লেটো নিজেও কিছু কম আসক্ত ছিলেন না। বস্তুত, রিপাবলিক-এর ওই দশম গ্রন্থেই হোমারের প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথাটা তিনি অকপট ব্যক্তি করেছেন।

প্লেটো তাহলে আর কবিতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন কেন? উত্তরটা আমরা প্লেটোর মুখেই শুনেছি। তিনি সত্যসন্ধ দার্শনিক; তীর দৃষ্টি সর্বোপরি সত্যের দিকে নিবন্ধ। এবং কবিতা যেহেতু সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাই—হোমারের রচনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-

ভালোবাসা সত্ত্বেও—এই শিল্পকে তঁর আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি সস্থান দিতে পারেন না। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, আবেগনির্ভর কবিতাকে তিনি যুক্তিনির্ভর দর্শনের বিরোধী একটি শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। কবিতা সম্পর্কের্তার অন্যবিধ আপত্তি, বলা বাহুল্য, এই মৌল আপত্তির সূত্র ধরেই এসেছে।

কিন্তু কবিতা কি সত্যিই সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়? নাকি সে তার নিজস্ব পথে পৌছোতে চায় দ্বিতীয় কোনও সত্যের ক্ষেত্রে, যাকে আমরা শিল্পের নিজস্ব সত্য বলে গণ্য করতে পারি? এই যে প্রশ্ন, এর উত্তর খুঁজে নেবার প্রয়াসে আমরা প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটলের কাছ থেকে সাহায্য পাব, র্যার কাব্য-বিষয়ক প্রস্তাবকে অনেকে- আমরা আগেই বলেছি- কবিতার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করে থাকেন।

যেমন অন্যবিধ শিল্পকে, তেমনই কাব্যকেও আরিস্টটল যে অনুকরণ বলে মনে করতেন, কিন্তু অনুকরণের অনুকরণ নয়, তার কারণ, বস্তুজগৎ তার কাছে নিতান্ত ছায়ামাত্র ছিল না, তাকে তিনি সত্য বলে মানতেন। ফলত, বস্তুজগৎকে যা অনুকরণ করে দেখায়, সেই কাব্যকে তিনি কখনও সত্য থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থিত ব্যাপার বলে মনে করেননি। কাব্যবিচারে গুরুশিষ্যের মতামতে আর-একটি পার্থক্যও আমরা লক্ষ না করে পারি না। আমাদের চিত্তের উপরে কাব্যের ক্লিয়া সম্পর্কে গুরু ও শিষ্য দুজনেই অবহিত ছিলেন; কিন্তু, তার গুরুর মতো, আরিস্টটল কখনও এমন সিদ্ধান্ত করেননি যে, কাব্যের কাজ হচ্ছে নেহাতই আমাদের দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে উসকে দেওয়া। বরং তঁর কাব্য-বিষয়ক প্রস্তাবে তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলছেন যে, কাব্যের আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে গিয়ে সাড়া জাগায়। শুধু তা-ই নয়, কাব্য যে দর্শনবিরহিত ব্যাপার, এমন কথাও তিনি মানলেন না। ইতিহাস ও কাব্যের তুলনাপ্রসঙ্গে বরং জানালেন যে, ইতিহাসের চেয়ে কাব্য আরও

দার্শনিক ও তার তাৎপর্য আরও দূরপ্রসারী, কারণ, কাব্য যে-ক্ষেত্রে সর্বজনীন সত্যের কথা বলে, ইতিহাস সে-ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কথা শোনায় মাত্র।(৬)

কাব্যের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাকে আমল দেননি। আরিস্টটল। বলেছেন, কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা কবুলে এক্ষেত্রে চলবে না; দেখতে হবে, কথাটা কে বলছে অথবা কাজটা কার। সেইসঙ্গে দেখতে হবে যে, সেই উক্তি অথবা আচরণের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিই-বা কে|..উক্তি অথবা আচরণের উদ্দেশ্য অথবা অভিপ্রায় কী, সেটাও হিসেবের মধ্যে ধরা চাই। ভেবে দেখতে হবে যে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, অথবা বৃহত্তর অমঙ্গলকে এড়াবার জন্য, কথাটা বলা হচ্ছে কি না অথবা কাজটা করা হচ্ছে কি না।(৭)

এই যে কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্ন করে না-দেখে, উদ্দেশ্য তাৎপর্য ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা, সাহিত্যবিচারে এই পদ্ধতির মূল্য যে কতটা, তা আমরা জানি। কিন্তু শুধু এই পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। আরিস্টটল, এই সঙ্গে তিনি আরও একটা কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কাব্যবিচারের ব্যাপারে যা কিনা আরও জরুরি। ইতিপূর্বে তিনি আমাদের বলেছেন যে, কাব্য কীভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সত্যকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সত্যের ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। এবারে তারই সূত্র ধরে তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে এলেন। কোনটা ভুল আর কোনটা নির্ভুল, তার বিচারের প্রসঙ্গে এসে বললেন, কাব্যশিল্প ও অন্যবিধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি এক নয়, সুতরাং তাদের (বিচার করবার) মানদণ্ডও হবে আলাদা।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটোর কাছে আমরা শুনেছিলুম যে, কবিতা কেন নয়। এবারে আরিস্টটলের কাছে পালটা উত্তর শোনা গেল। শিল্পকর্ম

সম্পর্কে প্লেটোর অভিমতকে অবশ্য অন্যভাবেও খণ্ডন করা যায়। তাঁর কাছে আমরা তিন রকমের টেবিলের কথা শুনেছি। ঈশ্বরের টেবিল (অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা), ছুতোর-মিস্ত্রির টেবিল ও চিত্রকারের টেবিল। আরও শুনেছি যে, ছুতোরমিস্ত্রির টেবিল ও চিত্রকারের টেবিলকে মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য করা যায় না। কেন না, টেবিলের মূল সত্তা থেকে তারা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থান করছে। দ্বিতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণ ও তৃতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণের অনুকরণ। এই যে তিন রকমের টেবিল, এদের মধ্যে প্রথমটিকে অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা বা ঈশ্বরের টেবিলকেই প্লেটো সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনটি টেবিলের উপযোগিতাও তিন রকমের। ঈশ্বরের টেবিল বা টেবিল-সংক্রান্ত বিশুদ্ধ ধারণা ব্যতিরেকে সূত্রধরের টেবিল নির্মিত হতে পারত না, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায় যে, সেই বিশুদ্ধ ধারণার উপরে কি আমরা ভাতের থালা রাখতে পারি? তা আমরা পারি না। তার জন্য সূত্রধরের টেবিলই আমাদের চাই। আবার সূত্রধরের টেবিল আমাদের নান্দনিক ক্ষুধা মেটায় না। সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য চাই চিত্রকরের আঁকা টেবিল। অর্থাৎ প্লেটো যাদের "অনুকরণ' ও "অনুকরণের অনুকরণ' বলছেন, উপযোগিতার বিচারে গুরুত্ব তাদেরও কিছু কম নয়।

প্লেটোর আপত্তিকে, বলাই বাহুল্য, সেদিক থেকে বিচার করেননি। আরিস্টটল। কিন্তু নানাবিধ শিল্পকর্মের প্রেরণা ও শ্রেণিবিভাজন(৮) সম্পর্কে সাধারণভাবে নানা কথা বলে নিয়ে অতঃপর বিশেষভাবে কবিতা সম্পর্কে তিনি যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর যুক্তিজাল, যেভাবে ইঙ্গিত করেছেন এই শিল্পের ধ্রুব ভূমিকার দিকে, ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যচিন্তাকে যে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল, আরিস্টটলের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে- খ্রিষ্টীয় ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীতে- রচিত কবিতা-বিষয়ক দুটি অতিবিখ্যাত নিবন্ধ তা

আমাদের জানিয়ে দেয়। সেখানে, সেই নিবন্ধদুটির উপরে, আরিস্টটলীয় কাব্যভাবনার ছায়াকে আমরা বারে-বারে সঞ্চারিত হতে দেখি। বলা বাহুল্য, আমরা সিডনির অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়ন্ট্রি এবং শেলির এ ডিফেনস অব পোয়ট্রি র কথা বলছি, পরে যাকে আমরা সংক্ষেপে শুধুই অ্যাপোলজি' ও 'ডিফেনস" বলে উল্লেখ করব।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কবিতাকে প্লেটো যে-ক্ষেত্রে দর্শনের বিরোধী-শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন (অন্তত দেখেছিলেন বলেই আমরা অনুমান করে থাকি), 'অ্যাপোলজি' অথবা "ডিফেনস"— কোনওটিরই লেখক সে-ক্ষেত্রে দর্শন ও কবিতার এই পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারটাকে মানতে চান না। অ্যাপোলজির লেখক, তার নিবন্ধের সূচনাতেই, প্রাচীনকালের এমন অনেক দার্শনিক ও চিন্তানায়কের কথা আমাদের জানিয়ে দেন, যারা-অন্তত প্রথক দিকে-কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেন তাদের চিন্তালব্ধ শস্যসম্ভা্েরকে, এবং সেই কারণে, সমকালীন জনসাধারণ যাঁদের, মূলত, কবি বলেই জানত।(৯) অর্থাৎ, যেটা তাদের বলবার কথা, সেটাকে তাঁরা কবিতার পোশাক পরিয়ে বলতেন বটে, কিন্তু আসলে তারা ছিলেন ছদ্মবেশী দার্শনিক। 'অ্যাপোলজির লেখকের এই বক্তব্য যে কবিতা ও দর্শনের মধ্যবর্তী পাচিলেটাকে বেশ জোরালো রকমের একটা ধাক্কা মারে, তাতে সন্দেহ নেই। সে-ক্ষেত্রে, "ডিফেনাস'-এর লেখক সেই পাঁচিলটাকে একেবারে গুড়িয়ে দেবার জন্য বললেন যে, কবিতার প্রতি যাঁর ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা'র কথা আমরা শুনে আসছি, সেই প্লেটোও আসলে একজন ছদ্মবেশী কবিই। বলা বাহুল্য, কবিতা ও গদ্যের কোনও কৃত্রিম বিভাজনকে শেলি কখনও মেনে নেননি। কবিতাকে শনাক্ত করতে গিয়ে তার শারীরিক গঠনবিন্যাসের উপরে চোখ রাখতেন না। তিনি, গুরুত্ব আরোপ করতেন। আমাদের ভাবনার যেটা ব্যক্ত রূপ, তার অন্যবিধ লক্ষণের উপরে। প্লেটোর রচনায় সেই লক্ষণগুলিকে যখন তিনি

দেখতে পেলেন, তখন প্লেটো যে বস্তৃত কবি, এই সিদ্ধান্তে পৌছোতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হল না।(১০)

দার্শনিকেরা কিংবা ঐতিহাসিকেরা যে কেন কবিতার মাধ্যমে তাদের তত্ত্বকথা অথবা ইতিবৃত্ত প্রচার করতেন, 'অ্যাপোলজির লেখকের কাছে তা-ও আমরা শুনেছি। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, অন্য মাধ্যমের প্রতি সাধারণ মানুষের ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা ছিল কবিতার প্রতি। ফলত, সাধারণ মানুষদের কাছে কোনও বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হলে কবিতার মাধ্যমেই সে-কাজ করতে হত, তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। (কবিতার মাধ্যমকে স্যার ফিলিপ সিডনি আসলে 'a great passport" বা মস্ত একটি ছাড়পত্র' আখ্যা দিয়েছেন, যা থাকলে তবেই জনচিত্তে প্রবেশ করা যায়।) অতঃপর তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে যান, এবং বলেন যে, দার্শনিকের চেয়ে কবির ভূমিকা আরও বড়ো, এবং তঁর ক্ষেত্রও আরও ব্যাপক। দার্শনিকের কথা তো শুধু মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোকে বোঝে, অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষক। আর কবির কথা সেই তুলনায় অনেক সহজপাচ্য (তীর গ্রাহ্যতার ভূমিও তাই অনেক বড়ো), এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, কবিই হচ্ছেন জনগণের প্রকৃত দার্শনিক।।(১১)

আর অনূতভাষিতা? ঠাট্টা করে সিডনি বলছেন, পৃথিবী থেকে নানা গ্রহতারার দূরত্ব যাঁরা মেপে দেখান, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মিথ্যের বহরটা কি আরও বড় নয়? কিংবা চিকিৎসকদের? কবিরা বরং সবচেয়ে কম মিথ্যাবাদী। মিথুক কারা? না যেটা সত্য নয়, সেটাকে যারা সত্য বলে জোরগলায় জাহির করে, তারাই হচ্ছে মিথুক। কিন্তু কবিরা (দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, সন্দেহে, সংশয়ে সারাক্ষণ যাঁরা পীড়িত, এবং 'যেন" ও "হয়তো'র রাজ্যে যাঁরা ঘুরে বেড়ান) তো তেমন জোরগলায় কিছুই জাহির করেন না। মিথ্যেটাকে সত্যি বলে 'অ্যাফার্ম" করবার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠতে পারে না, কেননা,

সিডনি বলছেন, “অ্যাফার্ম” করাটাই তাদের ধাতে নেই। (“...the poet never affirmeth.”)

অনৃতভাষিতার যে অভিযোগ, তার উত্তর অবশ্য অন্যভাবেও দেওয়া যায়। বলা যায় যে, যাকে আমরা অসত্য’ ভাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতিশয়োক্তি মাত্র। এই যে অতিশায়োক্তি বা বাড়িয়ে বলা, যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, এর প্ররোচনা কোত্থেকে আসে, তো উত্তরে আমরা শিল্পীর আবেগোচ্ছ্বাসের সঙ্গে একে যুক্ত করে দেখাতে পারি। বিজ্ঞানে কি ন্যায়শাস্ত্রে অতিশয়োক্তির কোনও অবকাশ নেই। তার কারণ, আবেগোচ্ছ্বাসেরও কোনও ভূমিকা নেই সেখানে। সেখানে যা-কিছু দাঁড়ায়, তা শুধু তথ্যভিত্তিক নিপট যুক্তির উপরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ইংরেজিতে যাকে

একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর তাই, কিছু-না-কিছু অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন সেখানে ঘটেই। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি:

“আজি বসন্তে বিশ্বখ্যাতায়
হিসেব নেই কো পুষ্পে পাতায়
জগৎ যেন বেঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে”(১২)

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, অতিরঞ্জনের এই ব্যাপারটাকে তিনি প্রকৃতির সৃষ্টিলীলার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর মানুষের সৃষ্ট শিল্পমালা তো সে-ক্ষেত্রে অসংখ্য অতিরঞ্জনে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি যে শিল্পেরই অঙ্গ, সে-কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। বায়রন যখন বলেন :

“Maid of Athens, ere we part,
Give, oh give me back my heart
Or, since that has left my breast,
Keep it now, and take the rest!”

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন–

“একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী” (১৪)

কিংবা আমাদের তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন বলেন :

“অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লখক মানুষের
মুখে-মুখে রটে যায় নীরার খবর “
বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি” (১৫)

তখন যুক্তিবাদী তার্কিক হয়তো বলবেন যে, এসব একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, বায়রন মোটেই তাঁর বক্ষ থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে সেটি আথেন্সের কোনো লালনার হাতে সমর্পণ করেননি, সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে (শুধু সুধীন্দ্রনাথ বলে কথা কী, কোনও মর্তমানবের পক্ষেই) সম্ভব নয়। ইন্দ্রপুরীর আনন্দ আন্দাজ করা, এবং, সুনীল যা-ই বলুন, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মুখে নীরা-নামী একটি বালিকার খবর রটে যাওয়াটা একেবারে আদ্যন্ত অসম্ভব একটা ব্যাপার; কিন্তু আমরা যারা অতিবাদকে শিল্পের অঙ্গ বলে জেনেছি, তারা এইসব উক্তির মধ্যে কোনও দোষ দেখব না, বরং শিল্পের রসে রঞ্জিত এই অতিশয়োক্তিগুলিকে আমরা কবিতার এক-একটি মহার্ঘ অলংকার বলেই চিনে নেব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তো বটেই, গানেও এই ধরনের অলংকার আমরা প্রচুর দেখতে পাই। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ছে "একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে" গানটির কথা। ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কবির তরুমুলে যে-মেয়েটি একদা উপবেশন করেছিল, তাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন যে, সেদিনকার কথা তার হয়তো মনে নেই, কিন্তু নদী তাকে ভোলেনি; এমনকি, নদী তার স্রোতের মধ্যে সেই মেয়েটির বেণির ছবিটিকে আজও ধরে রেখেছে।(১৬) শুনে সত্যান্বেষী তার্কিক হয়তো এক্ষেত্রেও বলবেন যে, এটা একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, নদী কাউকে মনে রাখে কিংবা আপন স্রোন্তোধারার মধ্যে ধরে রাখে। কারও বেণির চিত্র, এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাসজনক নয়। কিন্তু আমরা সে-কথা বলব না। আমরা ঠিকই বুঝে নেব যে, কবিই সেই মেয়েটিকে আজও ভুলতে পারেননি, এবং, নদীর বাঁকা স্রোতের দিকে চোখ পড়বামাত্র, কবিরই আজও সেই মেয়েটির বঙ্কিম বেণির কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই সত্য কথাটা সরাসরি না বলে কবি যে তাঁর স্মৃতিকে এক্ষেত্রে নদীর উপরে আরোপ করেছেন, এতেই বরং আরও সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর গানের বাণী। এটা অবশ্য অতিশয়োক্তি নয়, ঘুরিয়ে কথা বলবার ব্যাপার, কিন্তু অলংকার হিসেবে এর মূল্যও অপরিসীম।

কিন্তু আর নয়। কবিতার বিরুদ্ধে হরেক অভিযাগের ফিরিস্তি আমরা শুনেছি, এবং জেনেছি যে, কেন সেগুলি ধোপে টেকে না। সওয়াল-জবাবের মধ্য দিয়ে এই কথাটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, কবিতার প্রতি বিরূপ হবার সত্যি কোনও কারণ নেই। কিন্তু এটা হল নঞর্থক কথা, উলটো-দিক থেকে বিচার করবার ব্যাপার। এবারে সোজাসুজি আমরা কবিতার দিকে তাকিয়ে জেনে নিতে চাই যে, কোন সদর্থক (পজিটিভ) গুণ রয়েছে তার। বুঝতে চাই, তাকে আমরা সময় দেব কেন। অর্থাৎ, কেন আমরা কবিতা পড়ব।

কিন্তু তার আগে একটা সহজ কথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সেটা এই যে, কবিতা না-পড়লেই যে মানবজীবন একেবারে অচল হয়ে পড়বার আশঙ্কা, তা কিন্তু নয়। এমন একটা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা অনেকেই কল্পনা করেছেন, যেখানে কোনও মানুষেরই খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া, কাউকে সেখানে নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাতে হবে না, বিনাচিকিৎসায় মরতে হবে না, এবং প্রত্যেকেই সেখানে লেখাপড়া করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু, অন্তত এখনও পর্যন্ত, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবসথার কথা কেউ কল্পনা করেননি, যেখানে সবাই দিনের মধ্যে অন্তত কিছুটা সময় গান শুনতে কিংবা ছবি দেখতে চাইবে। ঠিক তেমন, সর্বজনে যেখানে কবিতা পড়তে চাইবে, এবং পড়বার সুযোগ না পেলে ভাববে যে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবসথার কথাও কেউ কল্পনা করেননি।

কেন করেননি, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। কবিতাপাঠ আমাদের নূযনতম চাহিদা বলে গণ্য হয় না। হবার কোনও কারণও নেই। অন্ন বস্ত্র আশ্রয় কর্মসংস্থান চিকিৎসা সাক্ষরতা ইত্যাদি যে আমাদের নূযনতম চাহিদা বলে গণ্য হয়, তার কারণ, এগুলি ছাড়া কারও চলে না। কিন্তু যেমন গান কিংবা ছবি, তেমনই কবিতা ব্যতিরেকেও অসংখ্য মানুষের দিন দিব্যি কেটে যায়।

সত্যি বলতে কী, তেমন মানুষ আমাদের চারপাশেই আমরা অহরহ দেখতে পাই। কবিতার প্রসঙ্গে বলি, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন বিস্তর প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব রয়েছেন, যাঁরা প্রতিবেশী আত্মীয় কিংবা বন্ধু হিসেবে হয়তো খুবই ভালো ও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কবিতা নামক ব্যাপারটার ছায়াও পারতপক্ষে মাড়ান না। কখনও যে তাঁরা কবিতা পড়েননি, তা হয়তো

নয়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, কিন্তু সে তো নেহাতই পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে নোট মিলিয়ে পড়া, পরীক্ষার পাট চুকে যাবার পরে কবিতার সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা চুকিয়ে দিয়েছেন, এবং তার জন্যে যে তাদের জীবন কোথাও ঠেকে থাকছে, তা-ও নিশ্চয় নয়। একদা তাঁরা দায়ে ঠেকে, বাধ্য হয়ে গুটিকয় কবিতা পড়েছিলেন, কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতার পর্ব শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আর-কখনও তাঁরা কবিতা পড়বেন না।

অনেকেই পড়েন না। এবং তা সত্ত্বেও তাদের দিন দিব্যি কেটে যায়। যেমন, গান না-শুনে এবং ছবি না-দেখেও অনেক মানুষেরই দিন দিব্যি কাটতে থাকে, এ-ও তেমনই ব্যাপার, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং ধরে নেওয়াই ভালো যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা সকলের জন্য নয়।

কারও-কারও জন্য। জীবনানন্দ বলেছেন, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সকলেই পাঠক নয়, কেউ-কেউ পাঠক।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পাঠক? কবিতা কি সত্যিই তাদের কিছু দেয়? যদি দেয় তো সেটা কোন বস্তু? কী সেই প্রাপ্তি, যার প্রত্যাশায় তাঁরা কবিতার দিকে, আবহমান কাল ধরে, হাত বাড়িয়ে আছেন?

একটা প্রাপ্তির কথা আমরা "ডিফেনস'-এর লেখকের কাছেই শুনি। তিনি বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়। পৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে অনবগুণ্ঠিত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যে-বস্তুজগৎকে আমরা চিনি, তাকেও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।(১৭)

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপনি নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।"(১৮) সেদিক থেকে যদি

দেখি, তা হলে বুঝতে হবে যে, কবির অনুভূতি এই যে ভাষার মধ্যে, অর্থাৎ বুপের মধ্যে, নিজের নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করছে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই পাঠকের পক্ষে একটা মস্ত প্রাপ্তি।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের আরও অনেক-অনেক উত্তর নিশ্চয় খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই, অন্য-কোনও উত্তরের সন্ধানে ব্যাপৃত হবার আগে বরং এই দুটি উক্তিকেই আর-একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শেলি বলছেন বস্তুজগতের কথা (কবিতা যার গোপন সৌন্দর্যের নির্মোিকটাকে খসিয়ে দেয়) আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন আন্তর অনুভূতির কথা (বৃপের মধ্যে যে-অনুভূতির নিত্যতা নিজেকে ‘প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে)। হঠাৎ শুনলে এই উক্তি দুটিকে- যার একটিতে দৃশ্যজগতের উপরে জোর পড়েছে ও অন্যটিতে আন্তর অনুভূতির উপরে- পরস্পরের বিরোধী বলে মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তা যে নয়, বরং এই উক্তি দুটি যে পরস্পরের পরিপূরক, একটু বাদেই তা আমরা ধরতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, যা দিয়ে কবিতা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই অপরিহার্য দুটি অংশের কথাই দুই কবি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। একজন বলছেন বিষয়বস্তু বা উপকরণের কথা। অন্যজন উপলব্ধির।

বলা বাহুল্য, কবিতার যেটা বিষয়বস্তুর দিক- কোনও কাহিনি কিংবা কোনও ঘটনা কিংবা কোনও দৃশ্য- সরাসরি তার কাছ থেকেও আমরা অনেকেই অনেক-কিছু পেয়ে যাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ আমরা করতে পারি। রাত্রি যখন আসন্ন, গর্জিত মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে সঙ্গীহীন একটি পাখি তখন উড়ে চলেছে, তার দুঃসময়’ কবিতার এই যে বিষয়বস্তু, শুধু এরই গুণে এই কবিতা যে কারও-কারও চিত্তে সাহসের সঞ্চার করে, আবার কারও-কারও চিত্তে প্রেরণা জোগায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও

পরিণামের কথা চিন্তা না করে আপনি ভূমিকায় সুস্থিত থাকতে, সে-কথা স্বীকার্য। ঠিক তেমনই "বর্ষশেষ' কবিতার বিষয়বস্তু আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে, হয়ে থাকে, নবীনতার অভ্যুদয়। আবার, একইভাবে, 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি থেকে আমরা আমাদের শোকার্ত সময়ে কিছু সান্ত্বনা পেতে পারি, এবং দুই পাখি' কবিতাটির বিষয়বস্তু থেকে বুঝে নিতে পারি যে, সুখ ও স্বাধীনতা কেন, আত্যন্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

এই যে সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষা এই কবিতাগুলির ভিতর থেকে অনেকে পেয়ে আসছেন, এবং আরও অনেক কাল ধরে আরও অনেকে পাবেন, এসব প্রাপ্তির কোনওটিরই মূল্য কিছু কম নয়। কবিতাপাঠের খুবই মূল্যবান কয়েকটি পুরস্কার বলে এদের আমরা গণ্য করতে পারি। কিন্তু, বিষয়বস্তুর সঙ্গে এদের সরাসরি যোগ-সম্পর্ক সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ওঠে। সেটা এই যে, কবিতার নিজস্ব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যদি-না পাঠকের কাছে এসে পৌঁছে।াত, তাহলে এই সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার ব্যাপারটা ঠিক এতটাই জোর পেত। কি না। তা যে কিছুতেই পেত না, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমরা বলতে পারি। আমরা জানি যে, এই ধরনের সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার কথা নানা নীতিগল্পের মধ্য দিয়েও আমাদের শোনানো হয়ে থাকে, কিন্তু এই কথাগুলি সেখানে এর সিকির সিকি জোরও পায় না।

কেন পায় না, সেটা বুঝবার জন্যে শেলির কাছেই আবার আমাদের ফিরতে হবে, এবং আর-একটু নজর করে দেখতে হবে তীর উক্তিটিকে। শেলি বলেছেন, কবিতা এই বস্তুপৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যার সৌন্দর্যকে গোপন বলা

হচ্ছে, সেই বস্তুপৃথিবী নিজে কিন্তু গোপন নয়, আমাদের চোখের সম্মুখেই সে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এমনকি, কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে যে তার সৌন্দর্যসম্ভার কারও চোখে পড়ে না, তা-ও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত, যাঁরা কবিতা পড়তে অভ্যস্ত নন, তাঁরাও তার অরণ্যের শ্যামশোভা, পর্বতের ধূমল বিস্তার, নদীর তরঙ্গভঙ্গ ও সমুদ্রের সফেন উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, তা-ই যদি হয়, তবে আর এই বস্তুপৃথিবীর সৌন্দর্যকে "গোপন" বলবার অর্থ কী, এবং এমন কথাই-বা। আমরা কী করে মানব যে, কবিতা সেই সৌন্দর্যকে গুন্ঠনমুক্ত করে। দেখায়?

শেলির উক্তির দ্বিতীয়াংশে এসে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা। সেখানে তিনি বলছেন, সৌন্দর্যের গুন্ঠনমোচন করে কবিতা তাকে "এমনভাবে-দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।" এই যে উক্তি, বস্তুত এটি একটি ধ্রুব ইঙ্গিত, এবং এরই সূত্র ধরে আমরা বুঝতে পারি যে, শেলি যাকে সৌন্দর্যের গুন্ঠনমেচন বলছেন, আসলে তা বিভিন্ন বস্তুরই এমন এক ধরনের উপস্থাপনা, আমাদের প্রাত্যহিক পরিচিতির স্পর্শে মলিন নানা বস্তু যার ফলে কিছুটা রহস্যময়তা পেয়ে যায়। পুরোনো, পরিচিত বস্তুসম্ভারকে সেই রহস্যময়তাই আবার নবীন করে তোলে।

তবে কি এসব বস্তুকে আমরা যেখান থেকে যেমনভাবে দেখি, কবিরা ঠিক সেখান থেকে দেখেন না বলেই তেমনভাবে দেখেন না? ঠিক তা-ই। তাদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন বলেই আলোছায়ার বদল ঘটে ও বস্তুগুলির তাৎপর্য অনেকটা পালটে যায়, এবং, কবিতা পড়বার সময়ে তাদের চোখ দিয়ে দেখি বলেই, আমাদের কাছেও সেই বস্তুগুলি কিছুটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, নির্দিষ্ট যে রূপের সীমার মধ্যে যাকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, শুধু তারই মধ্যে তার রূপগত সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, অন্যতর

রূপও তার মধ্যে নিহিত হয়ে ছিল, এবং কবি আমাদের দেখিয়ে না-দিলে সেই অন্যতর রূপ আমাদের চোখে কখনও ধরাই পড়ত না।

বলা বাহুল্য, যেমন বস্তু সম্পর্কে, তেমনই বিষয় সম্পর্কেও একথা সত্য। কবি তাঁর আপনি দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র আপনি অনুভূতি অথবা উপলব্ধির আলোয় যখন দেখেন, তখন তীর সেই দেখার গুণে আমাদের পরিচিত নানা বিষয়ের তাৎপর্যও অনেকখানি পালটে যায়, এবং তারই ফলে আমাদের চিত্তে সেইসব বিষয়ের অভিঘাত আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, সেই অভিঘাত যদি সাহস, প্রেরণা, শিক্ষা কিংবা সান্ত্বনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে না। উঠত, তাতেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কেন-না, কবিতার কাছে আমাদের প্রাপ্তি শুধু এইটুকুই নয়, আরও বেশি। সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি সৌন্দর্যদর্শন। যার অভিঘাত আরও ব্যাপ্ত হয়ে, বস্তৃত আমাদের সমগ্র চিত্ত জুড়ে কাজ করতে থাকে। শেলি যে বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। ও তার প্রসার ঘটায়, এ-ই হচ্ছে তার তাৎপর্য। তিনি যে আসলে বস্তুজগতের উপরে জোর দেননি, জোর দিয়েছেন কবির চোখে চোখ মিলিয়ে তাকে দেখবার উপরে, তা আমরা জেনেছি। জেনেছি যে, যাকে তিনি সৌন্দর্যের গুন্ঠনমোচন বলেছিলেন, আসলে সেটা আমাদের প্রতিদিনের দেখা সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কারের ব্যাপার। কবি তাঁর আপনি উপলব্ধির আলোয় তাকে খুঁজে নেন, এবং আমাদের চোখের সামনে তাকে তুলে ধরেন।

সৌন্দর্যের সঙ্গে এই যে পরিচয়, প্রাপ্তি হিসেবে এরই মূল্য হয়তো সর্বাধিক। কবিতা এই পরিচয়ের ক্ষেত্র রচনা করে দিচ্ছে; একের উপলব্ধিকে সে সর্বজনের করে তুলছে। শুধু তা-ই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল একটি

বিশেষ মানুষের একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি, তাকে সে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে নিত্যকালের দুয়ারে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়", তখন কবিতার এই নিত্যকালীন আবেদনের কথাটাই তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন।

---

১. পুরস্কার। সোনার তরী।

২. "...Poetry, the false Siren, the imitator of things which themselves are shadows, the ally of all that is low and weak in the soul against that which is high and strong, who makes us feed the things we ought to starve and serve the things we
ought to rule." আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব-র ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত তরজমার ভূমিকা। গিলবার্ট মারে।

৩. রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

8. "...the work of the artist is at the third remove from the essential nature of the thing." প্লেটোর রিপাবলিক-এর এফ.এম. কর্নাফোর্ড-কৃত তর্জমা। :

৫. হোমার যে কবিমাত্র, আরকিছু নন, এত জোর দিয়ে এ কথা বলবার হেতু নাকি এই যে, বিশেষভাবে হোমারকে ও সাধারণভাবে ট্র্যাজেডি -রচয়িতাদের সেই সময়ে- সফিসটি ও হোমার-আবৃত্তিকারদের পক্ষ থেকে- সর্বগুণান্বিত মানুষ হিসেবে প্রচার করা হত। বলা হত, তাঁরা পদ্মভুক মানুষ নন, মালবাহী শকট নির্মাণ ও রথচালনা থেকে শুরু করে সমরকৌশল্য-নির্ধারণ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্যা তাদের অধিগত; উপরন্তু নীতি ও ধর্মের ব্যাপারেও

‘সর্বসাধারণাকে তারা সঠিক পন্থার নির্দেশ দিতে সক্ষম। প্লেটো বস্তুত এই দাবিটিকেই অসার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন; যে-দাবি কবিকে দার্শনিকের আসনে বসায়, এবং দর্শনচর্চার পরিবর্তে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করে মানুষকে, তা মেনে নেওয়ার্তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। (প্লেটোর রিপাবলিক-এর কর্নাফোর্ড-কৃত তরজমায় দশম গ্রন্থের সূচনায় সন্নিবেশিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৬. “...poetry is something more philosophic and of greater import than history, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars.” আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব-র ইনগ্রাম বাইওয়াটার কৃত তরজমা।

৭. কবিতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রাজশেখরও পরবর্তীকালে অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন। কাব্যের অন্তর্ভুক্ত যে-উপদেশ বা আলোচনাকে সমালোচকেরা অনৈতিক (অসৎ বা গ্রাম্যতা-দোষযুক্ত) মনে করেন, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে রাজশেখরও তুলেছিলেন উদ্দেশ্যের কথা। বলেছিলেন, “এমন উপদেশ অথবা আলোচনা আছে ঠিকই, কিন্তু তার তাৎপর্যনিষেধমুখী, বিধিমুখী নয়।”

৮. আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব যে কাব্যের অন্তঃস্থ ঐশ্বর্যসম্পর্কে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, তা নয়, তবে অধিকতর উৎসাহ দেখায় নানাবিধ কাব্যের শ্রেণি, কুল ইত্যাদির পরিচয়-নির্দেশ। অর্থাৎ, তত্ত্বের তুলনায়, তথ্যের উপরেই সেখানে বেশি জোর পড়ে; কাব্যতত্ত্ব-র আলোচনা, সেদিক থেকে, মূলত বহিরঙ্গভিত্তিক। সমালোচনা সাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় (গ্রন্থ-পরিচিতি) ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, “...গ্রিক সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়।” এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য আলাদা করে আরিস্টটলের নামোল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই মন্তব্য যখন করেন, তখন, প্রধানত, কাব্যতত্ত্বর কথাই তিনি ভাবছিলেন।

৯. “...the philosophers of Greece durst not a long time

appear to the world but under the masks of poets. So Thales, Empedocles and Parmenides sang their natural philosophy in verses. So did Pythagoras and Phocydides their moral counsels. So did Tyrtaeus in war matters and Solon in matters of policy." An Apology for Poetry.

১০. "The distinction between poets and prese writers is a vulgar error. The distinction between philosophers and poets has been anticipated. Plato was essentially a poet-the truth and splendour of his imagery, and the melody of his language, are the most intense that it is possible to conceive.' A Defence of Poetry,

১১.'...the philosopher teacheth, but he teacheth obscurely, so as the learned only can understand him, that is to say, he teacheth them that are already taught, but the poet is the food for the tenderest stomachs; the poet is indeed the right popular philosopher," An Apology for Poetry.

১২. অতিবাদ। ক্ষণিকা।

১৩. Maid of Athens, ere we part. Occasional Pieces.

১৪. শাশ্বতী। আর্কেস্ট্রী।

১৫. নীরার অসুখ। বন্দী, জেগে আছো।

১৬. "সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী..."

১৭ "It poetry awakens and enlarges the mind itself....Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were unfamiliar." A Defence of

Poetry.

১৮. আধুনিক কাব্য। সাহিত্যের পথে।